International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 243-249
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.217

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণাদ্বৈতবাদ: জড় ও চিৎ-এর সমন্বয়

রুপম কামিল্যা
গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sri Aurobindo, having firm belief in the truth of the Upaniṣads, regards Saccidānanda Brahman as the ultimate reality; yet never denies the reality of the world. Sri Aurobindo thinks that the supreme aim of human life is to realize that the true reconciliation between pure, immutable consciousness and the material world is possible. He mentions that both materialism and asceticism are one sided views and fail to explain the harmony between these apparent opposites. Sri Aurobindo in his integrated philosophy is presenting a unique metaphysics that ties spirituality with practicality. In this paper, this approach that Sri Aurobindo employs to establish the harmony between matter and consciousness – two principles that appear to be fundamentally opposite, will be critically analysed.

Key words: Brahman, World, Integral Philosophy, Matter, Consciousness.

ভূমিকা:

আধুনিক ভারতবর্ষের অন্যতম দার্শনিক, কবি ও যোগী শ্রীঅরবিন্দ বৈদিক চিন্তাধারা ও উপনিষদীয় সত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি উপনিষদীয় সত্যে কেবলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করেননি, তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার লক্ষ্যে এই অদ্বৈতবাদী ভাবনাকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটকে সুদৃঢ় করে। পূর্ণাদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী শ্রীঅরবিন্দ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই একমাত্র সৎ বলে মনে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই ব্রহ্ম হলেন সৎস্বরূপ। কেননা ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু, তাঁর অতিরিক্ত অন্য কোনও বিষয়ের চরম বা পারমার্থিক অস্তিত্ব নেই। তবে ব্রহ্মকে একমাত্র সৎ বললেও শ্রীঅরবিন্দ জগতের বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করেননি, তাকে মায়া বলে মনে করেননি। তাঁর এই পূর্ণাদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যাই তাঁর ভাবনাকে অনন্যতা প্রদান করে। জগতের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী শ্রীঅরবিন্দ জগতের জড় ও চেতন প্রতিটি বস্তুকে ব্রহ্মেরই প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সে কারণেই তিনি মনে করেন, ব্রহ্ম বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে পরিব্যাপ্ত, বিশ্বে যা কিছু বিরাজমান, সমস্ত কিছু সেই পরম ব্রহ্মেরই প্রকাশ। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ বলে জগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে, ব্রহ্ম শুধু সৎ নয়, চিৎস্বরূপও। চিৎ হল ক্রিয়াশক্তি। এই ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মের মধ্যে বিরাজমান বলে ঐ শক্তি থেকেই ব্রহ্ম বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। তবে ঐ শক্তি থেকে জগৎ সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা থাকে। প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি আত্মসচেতন, কিন্তু নিষ্ক্রিয়। এইসময় সে জগৎ রূপে প্রকাশিত হয় না, তাই এটি বিস্তারহীন ও বিশ্রামের অবস্থা; এটি স্থির ও নিশ্চল অবস্থা। এই অবস্থায় ব্রহ্ম অকালিক, গতিহীন, অপ্রকাশিত, দ্রষ্টা ও সাক্ষী। দ্বিতীয় পর্যায় হল জগতের

আধাররূপে ব্রহ্মের উপস্থিতি। এ সময়ে ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তির মধ্যে জগতের সকল বস্তুর উৎপাদনের সম্ভাবনা বিশিষ্ট অবস্থায় বিরাজ করে। এ হল জগৎ উৎপত্তির পূর্বাবস্থা। উৎপন্ন না হলেও ব্রহ্মের মধ্যে জগৎ উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁর মধ্যে ত্রিকালের সমস্ত বস্তুই সমাহিত রয়েছে। এই পর্যায়টি অকালিক নয়, যেহেতু আদি, মধ্য ও অন্ত- ত্রিকালের মধ্যে সমাহিত। সর্বশেষ পর্যায়টি হল চিৎশক্তির ক্রিয়াশীল অবস্থা। চিৎশক্তির সক্রিয়তা ও ক্রিয়াশীলতার কারণে ব্রহ্মের চিৎশক্তি থেকে জগতের উৎপত্তি হয়েছে। এসময়ে অসীম চৈতন্যবিশিষ্ট ব্রহ্ম জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। এছাড়াও জগতের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান, যাবতীয় কর্ম ও শক্তি বিদ্যমান, যা কিছু ঘটছে, সেই সমস্ত কিছুই ঐ চিৎশক্তির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ চিৎশক্তিকে মাতৃশক্তি (The Mother Force) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১] জননী যেমন নিজ গর্ভ থেকে তাঁর সন্তানকে সৃষ্টি করেন, তেমনি ব্রহ্মের চিৎশক্তি থেকে সমগ্র জগতের সৃষ্টি সম্ভব বলে চিৎশক্তিকে তিনি মাতৃশক্তি বলেছেন। আবার ব্রহ্ম কেবল সৎ ও চিৎ নয়, তা আনন্দস্বরূপও। কেননা ব্রহ্ম তাঁর আনন্দের কারণে নিজে সঙ্কুচিত হয়ে জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন। ব্রহ্মের এই তিনটি স্বরূপের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই, আবার এই তিনটি একটি অপরটি থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এমনও নয়। এই তিনটিই সমতুল্য। কেননা যা সৎ তাই চেতনা। আবার যা চেতনা তাই আনন্দ। সুতরাং এই তিনটি অবিনাভাব সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাদের একটি অপরটি ব্যতীত থাকতে পারে না। তাই সৎ, চিৎ ও আনন্দ বিরোধশূন্য ও অভেদ সম্পর্কে সম্পর্কিত।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, জীবনের মূল্যকে উপলব্ধি করতে হলে, আত্ম-উত্তরণ করতে হলে জড় ও চিৎ-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে জড় নিশ্চেতন ও চিৎ সচেতন হওয়ায় তাদের পরস্পরবিরুদ্ধ বলে মনে হয়। জড় ও চিৎ পরস্পরবিরোধী হওয়ায় তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে জীবনের মূল্যকে, মানবজীবনের তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। জড় ও চিৎ সম্পর্কহীন হলে জড়দেহ কার নির্দেশে চালিত হবে? নিশ্চেতন জড়দেহের প্রয়োজনই বা কী? চিদাত্মাই বা কোথায় অবস্থান করে সে তার ইচ্ছাগুলিকে পূরণ করবে? কীভাবেই বা সেই আত্মা উত্তরণের পথে অগ্রসর হবে? তাই মানবজীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য জড় ও চেতনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়, তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রশ্ন হয় যে, জড় ও চিৎ- এই আপাত বিরোধী দুই তত্ত্বের মধ্যে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হতে পারে?

শ্রীঅরবিন্দ এই প্রশ্নের বিচারপূর্বক উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করার পূর্বে এই আপাত বিরোধী দুই তত্ত্বের মধ্যে যে দুটি নিষেধের কথা উল্লেখিত হয়েছে তা প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন। নিষেধ দুটি হল- জড়বাদীর নিষেধ এবং বৈরাগীর নিষেধ।[২] জড়বাদীর নিষেধ অনুসারে, জড়ই একমাত্র সত্য এবং চিৎ মনের কল্পনামাত্র। যেহেতু বিশ্বে প্রথম থেকেই জড়ের লীলা চলছে, তাই জড়ই সব, জড় থেকেই বিশ্বের সমস্ত কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চিৎ বলে বাস্তবিক কিছু নেই, চিৎ জড়েরই উপবস্তু। সুতরাং তা জড় ভিন্ন অন্য কিছু নয়। জড়বাদীর এই সিদ্ধান্তের পশ্চাতে যুক্তি এই যে, যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি, কেবল তারই অস্তিত্ব রয়েছে। আর যা প্রত্যক্ষের অতীত তার অস্তিত্ব নেই, সে অসৎ বা মনের কল্পনামাত্র। জড়কে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায় বলে জড়ই একমাত্র সৎ এবং জড়েরই একমাত্র অস্তিত্ব রয়েছে। চৈতন্য বা আত্মা ইন্দ্রিয়লব্ধ নয় বলে চৈতন্য বা আত্মা হল অসৎ, অনস্তিত্ববান। এখন কোনও ব্যক্তি বলতে পারেন, প্রত্যক্ষের মাধ্যমে চেতনাত্মক আত্মার জ্ঞান সম্ভব না হলেও সেই জ্ঞান আমাদের অনুমানের মাধ্যমেও

---

[১] He calls it The Mother, Basant Kumar Lal, *Contemporary Indian Philosophy* (Delhi: Motilal Banarsidass, 2017), P. 168.

[২] শ্রীঅরবিন্দ, *দিব্য-জীবন* (পন্ডিচেরী: শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ২০২০), পৃ: ৬।

সম্ভব হতে পারে। কিন্তু অনুমান প্রমাণ যেহেতু প্রত্যক্ষের উপরই নির্ভরশীল সেহেতু চৈতন্যময় আত্মাকে অনুমানের মাধ্যমেও জানা সম্ভব হয় না। সুতরাং জড়বাদীদের মতে, জড়ই বিশ্বের মূল, আর অতীন্দ্রিয় আত্মা মনের কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

"জ্ঞানমাত্রই ইন্দ্রিয় নির্ভর" জড়বাদীর এই বক্তব্যের মধ্যে অজ্ঞেয়তাবাদের চিহ্ন রয়েছে। কেননা জড়বাদীরা বলেন, যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষলব্ধ নয় তা অনস্তিত্বশীল হওয়ায় অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই অজ্ঞাত বিষয়কে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় না বলে জড়বাদও একধরণের অজ্ঞেয়বাদে পরিণত হয়েছে। তবে জড়বাদ অজ্ঞেয়বাদের দিকে অবনত হলেও তা যুক্তির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। যুক্তিকে অধিক প্রাধান্য দেওয়ায় ব্যক্তির বুদ্ধি অনেক তীক্ষ্ণ ও শাণিত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ সে বহু যুক্তিবিরোধী কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছে। অতীতে ব্যক্তি বহু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসে লিপ্ত থাকায় সে সত্যকে অনুভব করতে পারে নি, সে সর্বদা ভ্রান্ত জ্ঞানের মধ্যে নিমগ্ন থাকত। কিন্তু বর্তমানে সে প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ায় সে তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে অধিক পরিব্যাপ্ত করেছে। সুতরাং যুক্তিসম্মত জড়বাদের ফলে প্রকৃত জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি হওয়ায় সমগ্র মানবজাতির নিকটে এই জড়বাদের মূল্য অপরিসীম।

অপরদিকে বৈরাগীর নিষেধ অনুসারে চিৎই একমাত্র সত্য এবং জড় মনের কল্পিত বিভ্রমমাত্র। প্রকৃতপক্ষে চিৎই সব, চিৎ থেকেই জগতের সমস্ত কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। বৈরাগীরা এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে বিবিধ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। প্রথমত, তাঁরা বলেন, চিৎই একমাত্র সদ্বস্তু, কেননা চিৎ অপরিবর্তনীয়, নিত্য ও অপরিণামী। কিন্তু জড় অনিত্য, পরিবর্তনশীল ও পরিণামী হওয়ায় তার কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই। কারণ যে নশ্বর ও অনিত্য সে চিরন্তন সত্য হতে পারে না; সে অসৎ ও মনের বিভ্রমমাত্র। দ্বিতীয়ত, চিৎকে পরম পুরুষার্থ মনে করার পশ্চাতে বৈরাগীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি এই যে, জড়জগতে ব্যক্তি সর্বদা ভোগ-বাসনা ও আসক্তির মধ্যে নিমগ্ন থাকে। এই ভোগবাদী মানসিকতার মধ্যে আসক্ত থাকায় ব্যক্তি জগতে বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। এই দুঃখ থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে কোনও লৌকিক উপায় সম্বন্ধে সে অবগত নয়। এই দুঃখের নিবৃত্তি জন্য ব্যক্তিকে তার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে নিজের অন্তঃস্থিত চৈতন্যকে উপলব্ধি করতে হয়। এই চৈতন্যকে অনুভব করতে হলে ব্যক্তিকে বাহ্যিক আসক্তি ও দুঃখময় জড়জগতকে প্রত্যাখ্যান করে বৈরাগীদের মতো চিৎসত্তার দিকে একাগ্র চিত্তে মনোনিবেশ করা উচিত। তৃতীয়ত, বৈরাগীরা শঙ্করাচার্যের মতো বলেন, জড়জগৎ মায়া তাই মিথ্যা। শঙ্করাচার্য বলেন, মায়ার দ্বিবিধ শক্তি- আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি। মায়া তার আবরণ শক্তির বলে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করে, যার ফলে ব্যক্তি নিজেকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে মনে করে। অপরদিকে মায়ার বিক্ষেপ শক্তির বলে ব্যক্তি জড়জগতকে সত্য বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড়জগতের কোনও পৃথক অস্তিত্ব নেই, জড়জগৎ মিথ্যা ভ্রমমাত্র। যখন ব্যক্তি মায়া বা অবিদ্যার আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে বিদ্যার দিকে ধাবিত হয় তখন সে নিজেকে ব্রহ্ম স্বরূপ বলে উপলব্ধি করে এবং মায়ারূপ জগৎ তার নিকটে মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। শঙ্করাচার্যের এই মত অবলম্বন করে বৈরাগীরা জড়কে মিথ্যা ও মায়া বলে মনে করে জড়ের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। চতুর্থত, বৈরাগীরা বলেন, "চিৎই একমাত্র সত্য", এই চিৎ-এর দিকে অগ্রসর হতে হলে জড়জগতকে অস্বীকার করতে হয়। কেননা জড়জগতকে স্বীকার করলে ব্যক্তি সর্বদা এই জগতের মধ্যে আসক্ত থেকে নিজেকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। এই আসক্তিই তাকে চিৎ-এর নিকটে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। এই কারণে বৈরাগীরা বলেন, ব্যক্তি যদি সংসার জীবনকে ত্যাগ করতে পারে তবেই সে এই সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে চিৎ-এর নিকটে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। তবে

বৈরাগীর এই নিষেধটি জড়বাদী নিষেধের তুলনায় অধিক বিপদজনক, কেননা এই নিষেধে সংসার জীবনকে অস্বীকার করে ব্যক্তি বৈরাগী বা সন্ন্যাসীর জীবন পালন করতে আরম্ভ করে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, জড়বাদীর নিষেধ ও বৈরাগীর নিষেধ উভয়ই একপক্ষীয় ও একদেশদর্শী। জড়বাদ এবং অধ্যাত্মবাদের কোনও ব্যাখ্যার মাধ্যমে সত্যকে সম্পূর্ণ রূপে জানা যায় না এবং এরা উভয়েই জড় ও চেতনার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ। তিনি বলেন, জড়বাদীর মতে, জ্ঞান ইন্দ্রিয় নির্ভর; তা সর্বদা ইন্দ্রিয় পরিসরেই সীমাবদ্ধ। যা ইন্দ্রিয়লব্ধ নয় সেই বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়, তা অজ্ঞাত। কিন্তু জ্ঞানের সম্ভাবনা সম্পর্কে জড়বাদীদের এই অভিমত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে তৃপ্তি প্রদানে ব্যর্থ। তার কারণ নিম্নে আলোচিত হল-

প্রথমত, প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ব্যক্তির যে সকল বিষয়ের জ্ঞান হয়, তা যে সর্বদা সত্য হবে এমন নয়, তা অনেকসময় ভ্রান্তও হতে পারে। তাই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই একমাত্র সত্য নয়। রজ্জু ও সর্পের মধ্যে, শুক্তি ও রজতের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলে আমরা পর্যাপ্ত আলোর অভাবে অনেকসময় রজ্জুকে সর্প বলে, শুক্তিকে রজত বলে মনে করি। এই ধরণের ভ্রম আমাদের প্রায়শই হয়ে থাকে। এ কারণে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে সকল জ্ঞান অর্জন করি সেই জ্ঞান সর্বত্রই যথার্থ হবে একথা বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞান ইন্দ্রিয় পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জগতের সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত হতে পারে এমন নয়। জগতে বহু সূক্ষ্ম বিষয় আছে যাদের স্থূল জড়-ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ কখনই সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। তাই স্থূল প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানই যে একমাত্র সত্য একথা বলা যায় না। সেজন্য সেই সমস্ত অতীন্দ্রিয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করতে হলে ব্যক্তির স্থূল ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ব্যক্তি অলৌকিক বস্তু তথা আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করতে পারে। আবার শুধু সূক্ষ্ম বিষয় নয়, ব্যক্তির মধ্যে এমন বহু বৃত্তি ও সামর্থ্য বিদ্যমান, যা স্থূল-ইন্দ্রিয়ের পরিসরের মধ্যে পড়ে না, বরং এই সামর্থ্য ও বৃত্তিই ইন্দ্রিয়ের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। স্পষ্টতই আমরা লক্ষ্য করি, স্থূল-জড়জগতের মধ্যে বহু সূক্ষ্ম বিষয় আছে বলে, ব্যক্তির মধ্যে বহু ইন্দ্রিয়াতীত বৃত্তি বিরাজমান বলে জড়বাদীর প্রস্তাবই যে একমাত্র সত্য তা বলা যায় না।

তৃতীয়ত, জড়বাদীরা যখন ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে সত্য বলে গ্রহণ করে প্রত্যক্ষাতীত জ্ঞানকে মনের বিভ্রম বলে কল্পনা করে তখন তার কারণ এই নয় যে তাঁরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। তাঁদের মনে এমন সংস্কার এসেছে, তাঁরা এমন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, প্রথম থেকেই তাঁরা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে সত্য বলে স্বীকার করেছে। ফলে তাঁরা যখন ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চায় তখন সেই জ্ঞানকে প্রথমেই সত্য বলে স্বীকার করায় তাঁদের যুক্তিতে সিদ্ধ-সাধন[৩] দোষ হয়। ফলে নিরপেক্ষবাদীর নিকটে জড়বাদীর এই যুক্তি নিষ্প্রমাণ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বহু কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে দূর করে সত্যের দিকে নিয়ে যায় বলে শ্রীঅরবিন্দ জড়বাদের যেমন প্রশংসা করেছেন তেমনি জড়বাদের বক্তব্যকে চরমভাবে স্বীকার না করে তাঁর সীমাবদ্ধতারও উল্লেখ করেছেন। জড়বাদীর প্রস্তাবকে চরমভাবে স্বীকার করলে আমাদের অতীন্দ্রিয় বিষয়কে অস্বীকার করতে হয় বলে সেক্ষেত্রে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমস্যাটি হল, যদি স্থূল-জড়জগৎ ব্যতীত কোনও অতীন্দ্রিয় জগৎ বাস্তবিক থাকে তবে সেই অতীন্দ্রিয় জগতের অনুসন্ধান কার্যেরও সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। এর ফলে জড়বাদ সর্বদা স্থূল-

---

[৩] যে বিষয়কে প্রমাণ করতে চাই সেই বিষয়কে যদি প্রথম থেকেই সত্য বলে গ্রহণ করি তাহলে যুক্তিটিতে সিদ্ধ-সাধন দোষ হয়। যে বিষয়কে আমরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধ বলে স্বীকার করে নিয়েছি, সেই বিষয়কে প্রমাণ করতে হলে এরূপ দোষ হয়।

জড়জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। জড়বাদের এই সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে শ্রীঅরবিন্দ অতীন্দ্রিয় বস্তুকে স্বীকার করেছেন, যেহেতু অতীন্দ্রিয় বস্তুকে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। তবে জড়বাদকে চরমভাবে স্বীকার না করলেও তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ জড়জগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন না। কারণ জড়কে অস্বীকার করলে মানবজীবনকে পরিত্যাগ করতে হয়। আর মানবজীবনকে বর্জন করলে চিৎ-এর দিকে উত্তরণ কখনই সম্ভব হয় না। কারণ জীবনের অস্তিত্বই যদি না থাকে তাহলে ব্যক্তি কীভাবে তার বর্তমান অবস্থাকে অতিক্রম করে উন্নততর অবস্থায় উত্তরণ করবে? সেজন্য উত্তরণের উচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য ব্যক্তিকে তার জীবন ও জগতকে স্বীকার করতে হয়।

চিৎ-এর দিকে উত্তরণই যেহেতু ব্যক্তির অন্যতম লক্ষ্য, সেহেতু চিৎ বা চৈতন্যও সত্য। কিন্তু চৈতন্যকে সত্য বলে স্বীকার করলেও শ্রীঅরবিন্দ বৈরাগীদের সিদ্ধান্তকে চরমভাবে গ্রহণ না করে তারও সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করেছেন। বৈরাগীরা যখন বলেন, "চিৎই একমাত্র সত্য এবং জড় মনের কল্পিত বিভ্রমমাত্র", তখন শ্রীঅরবিন্দ 'চিৎ সত্য'- বৈরাগীদের এই অভিমতকে স্বীকার করলেও বৈরাগীদের ন্যায় জগতকে মিথ্যা ও মায়া বলেননি, বরং জগতের অস্তিত্বকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, বৈরাগীরা যখন জড়কে মায়া বলে অভিহিত করেছেন তখন তা ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে জড় হল চিদাত্মারই একটি রূপ। সেজন্য জড়কে ত্যাগ করলে চিদাত্মার রূপকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়। শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেন, আত্ম-উত্তরণ করতে হলে জড়কে ত্যাগ করতে হবে এমন নয়, বরং জড়কে রূপান্তরিত করেই আমরা চিৎ স্বরূপের দিকে অগ্রসর হতে পারি। মানুষ প্রথমে জড়কে নিয়েই জীবন অতিবাহিত করে, তারপর ধীরে ধীরে জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে অতিমানস- এভাবে রূপান্তরের মাধ্যমে উত্তরণ করতে করতে এমন এক কালের উদয় হবে যখন আমরা চিৎ স্বরূপের দিকে অগ্রসর করতে পারব। সুতরাং জড়কে পরিত্যাগ করে নয়, জড়কে আঁকড়ে ধরেই আমরা পরম লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে পারি। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ বলেন, জড় ও চিৎ-এর মধ্যে কোনোটিই মূল্যহীন নয়, উভয়েরই গুরুত্ব অপরিসীম। তাই জড়বাদীরা ও বৈরাগীরা যখন নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেদের দর্শন গঠন করেছিলেন, তা একদেশদর্শী ও একপক্ষীয়। কেননা উভয় দর্শনেই জড় এবং চিৎ-এর মধ্যে একটিকে চরমভাবে স্বীকার করে অপরটিকে চরমভাবে বর্জন করা হয়েছে। সেজন্য এদের কোনও ব্যাখ্যাই সম্পূর্ণ সত্য না হওয়ায় শ্রীঅরবিন্দ একটি ভিন্ন মত পোষণ করে জড়কেও যেমন সত্য বলে স্বীকার করেছেন তেমনি চিৎকেও সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

জড় ও চিৎ যে উভয়ই সত্য তার প্রমাণ উপনিষদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদে ঋষি বলেছেন, প্রত্যক্ষ দুইরকমের হয়। যথা- পরাক্ প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ প্রত্যক্ষ।[৪] পরাক্ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ব্যক্তি বাহ্যবস্তুকে দর্শন করতে পারে। আর প্রত্যক্ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের অন্তঃস্থিত আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে। সাধারণত ব্যক্তিদের দৃষ্টি সর্বদাই বাহ্যিক বিষয়ের দিকে থাকে, তারা সর্বত্রই বাহ্যিক বিষয় নিয়েই জীবনযাপন করতে চায়, তারা অন্তরের সত্যকে জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন না এবং এই বাহ্য জীবনকেই তারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। কিন্তু কোনও ব্যক্তির মধ্যে যদি বাহ্যজগৎ ব্যতীত নিজের অন্তঃস্থিত আত্মাকে উপলব্ধি করার উৎসাহ দেখা যায়, তাহলে সে প্রত্যক্ দৃষ্টির মাধ্যমে নিজের আত্মাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং পরাক্ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ প্রত্যক্ষ উভয়ই মূল্যবান। কেননা পরাক্ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ব্যক্তি যখন জড়কে উপলব্ধি করে, তা যেমন সত্য, তেমনি প্রত্যক্ প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যক্তি যখন নিজের অন্তঃস্থিত চৈতন্যময় আত্মাকে উপলব্ধি করে, তাও সত্য। ব্যক্তি এই দুই সত্যের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজমান। কেননা ব্যক্তির যেমন জড়দেহ আছে

[৪] অনির্বাণ, *দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ* (কলকাতা: শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ২০১৬) পৃ: ৫।

তেমনি তার আত্মাও রয়েছে। তাই শ্রীঅরবিন্দ কোনও কিছুকেই অস্বীকার করেনি, তিনি যেমন জড়কে স্বীকার করেছেন তেমনি আত্মাকেও সত্য বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ কেবল যে জড় ও চিৎকে স্বীকার করেছেন তাই নয়, তিনি বলেন, জড় ও চিৎ-এর মধ্যে সমন্বয় সাধনও সম্ভব। সাধারণ মানুষ তার প্রাকৃত বুদ্ধির কারণে জড় ও চিৎকে যে পরস্পরবিরোধী বলে মনে করছে, তা যথাযথ নয়। প্রকৃতপক্ষে জড় ও চিৎ কোনও পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয় নয়, তারা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, তারা একটি অপরটি ব্যতীত থাকতে পারে না। সুতরাং তাদের মধ্যে অবিরোধই বিদ্যমান, তাদের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্যই দৃশ্যমান। দৈনন্দিন জীবনে লক্ষ্য করি, ব্যক্তির অস্তিত্বে যেমন জড়দেহের গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি চিদাত্মারও মূল্য রয়েছে। যদি জড়দেহের অস্তিত্বই না থাকে তাহলে চিদাত্মা কোথায় অবস্থান করে তার ইচ্ছাগুলিকে পূরণ করবে? সে কোথায় আধারিত হয়ে তার কার্য সাধন করবে? তাই চিদাত্মার একটি আধারের প্রয়োজন, সেই আধারটি হল জড়দেহ। জড়দেহ হল চিদাত্মার দেহ ও রূপ, চিদাত্মার কার্য সাধন করার উপায়; চিদাত্মা জড়দেহের মধ্যে অবস্থান করেই তার ক্রিয়াগুলিকে পূরণ করে। তাই জড়দেহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার ঐ জড়দেহ আত্মার নির্দেশে চালিত হয় বলে চিদাত্মাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ব্যক্তি স্থূল জড়জগতকে স্বীকার করলেও সে সর্বদা সূক্ষ্ম জগতের দিকে অগ্রসর হতে চায়, তার বিকাশসাধন করতে চায়। অতত্রব ব্যক্তি জড়দেহের মধ্যে অবস্থান করেও চিৎ-এর প্রকাশ আকাঙ্খা করে বলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তাদের সমন্বয়েই একটি অখন্ড ও পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন গঠন করা সম্ভব।

বিশ্বে জড় ও চিৎ- উভয়ের গুরুত্ব থাকলেও তাদের মধ্যে চিৎ প্রধান এবং জড় গৌণ। কেননা চিৎশক্তি থেকেই জড়শক্তি উদ্ভূত, চিৎই জড়ের শাসক, চিৎই জড়ের নিয়ন্ত্রক। চিৎশক্তিই বিশ্বের মূল। বিশ্বে জড়ের গুরুত্ব থাকলেও ব্যক্তি সর্বদা জড়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাই না, ব্যক্তি তার মধ্যে চিৎ-এর প্রকাশ আকাঙ্খা করে। কেননা চিৎ-এর দিকে অগ্রসর হওয়াই মানবজীবনের অন্যতম লক্ষ্য। চিৎ-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য জড়দেহের মূল্য থাকলেও জড়ই জীবনের অন্তিম লক্ষ্য নয়; তার লক্ষ্য অন্তরের সত্যকে, আত্মজ্ঞানকে অর্জন করা। তবে এই জ্ঞানকে অর্জন করা এত সহজসাধ্য বিষয় নয়। কেননা জগতে ব্যক্তি সর্বদা দেহ ও মন নিয়েই জীবনযাপন করে, এই দেহ ও মনের অন্তরালে পৃথক কোনও সত্তার অস্তিত্ব নেই। তাই সে সর্বদা স্থূল-জড়জগতের মধ্যেই বিচরণ করে। এই জড়জগতের অতিরিক্ত কোনও অন্তর্জগৎ সম্পর্কে পরিচিত নয় বলে সে তার স্থূল আকাঙ্খাকে পূরণ করতে চায়, সে তার ব্যক্তিগত চাহিদা ও স্বার্থ পূরণে প্রয়াসী হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সে যখন অনুধাবন করতে পারে, এই অহং-ভাব, দেহ ও মন জীবনের একমাত্র সত্য নয়; এই অহংবাদী মনোভাবের অন্তরালে নিশ্চয়ই এমন কোনও সত্তা বিদ্যমান, যে সত্তা আমাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছে। অবিদ্যাবশত যতক্ষণ সে এই সত্তার অস্তিত্বকে অবগত হতে না পারে ততক্ষণ সে এই জগতের মধ্যে অবস্থান করলেও আধ্যাত্মিক আকূতি তাকে এই জগতের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যেতে অনুপ্রেরণা দেয়। কেননা জড়জগতের মধ্যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মাধ্যমে বিবিধ ভোগ-বাসনাযুক্ত বিষয়বস্তুকে অর্জন করলেও তার দ্বারা ব্যক্তির পূর্ণ তৃপ্তি কোনও দিনই সম্ভব হয় না। এজন্য তাকে আরও বৃহত্তর কিছু অর্জন করতে হবে – এই আকাঙ্ক্ষা তাকে তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে উদ্বুদ্ধ করে। সে অনুধাবন করতে পারে, এই ভোগ-বাসনা ও আকাঙ্খা ব্যক্তির জীবনের চরম লক্ষ্য নয়; এই আসক্তির ওপরে নিশ্চয় একটা মহত্তর সত্য রয়েছে, একটা পরম সত্য রয়েছে, যে সত্যকে উপলব্ধি করার আস্পৃহা সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দেখা যায়। এজন্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মাধ্যমে ব্যক্তি সাময়িকভাবে তৃপ্ত হলেও আজীবন জড়সর্বস্ব ভোগবাদী মানসিকতায়, ইন্দ্রিয়ের সংকীর্ণ গন্ডিতে তৃপ্ত থাকতে পারে না। সুতরাং মানুষের লক্ষ্য স্থূল-জড়কেন্দ্রিক নয়; তার লক্ষ্য স্থূল বাহ্যজগতের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এমন সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করা, এমন পরম সত্তার দিকে ধাবিত

হওয়া, যাঁকে অর্জন করতে পারলে তার জীবন পূর্ণ হবে, তার জীবনে অতৃপ্তির কোনও অবকাশ থাকবে না। এই সত্যকে উপলব্ধি করলে ব্যক্তি কেবলমাত্র অবিদ্যা থেকে পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয় না অথবা জড়, প্রাণ ও মন বিশিষ্ট ক্রিয়া থেকে মুক্ত হয় না; সে জগতের সকল আত্মাকে জানতে চায়, তার সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধি করতে চায়। এইসময় মিত্রের সঙ্গে শত্রুর কোনও পার্থক্য থাকে না, নিজের সঙ্গে অপরের কোনও ভেদ থাকে না। কেননা সে তখন নিজের মধ্যে বিশ্বচেতনাকে দেখতে পায়, বিশ্বাত্মার মধ্যে নিজেকে সন্ধান করে। সুতরাং এ হল সর্বভূতের মধ্যে একাত্মতা বোধ। আবার সে এখানেই ক্ষান্ত নয়, সে বিশ্বাত্মাকে অতিক্রম করে জগদতীত পরম সত্তা, পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারে। এরূপ অনুভব হলে সে পরম আনন্দে উন্মত্ত হয়, তার মধ্যে এক উচ্চ জ্যোতি, এক শাশ্বত দিব্যানন্দ প্রজ্জ্বলিত হয়। তবে এই আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে ব্যক্তিকে নিজের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে নিজের অন্তঃস্থিত চৈতন্যকে বা চিৎসত্তাকে অনুসন্ধান করতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়। এই চিৎসত্তাকে উপলব্ধি করার জন্য ব্যক্তিকে জড়দেহ ধারণ করতে হয়। জড়দেহে আধারিত হয়ে ব্যক্তি ঐ চিৎ-এর নিকটে অগ্রসর হয় বলে চিৎ-এর কাছে জড় যেমন বাস্তব, তেমনি জড়ের নিকটে চিৎ হয় বাস্তব। সুতরাং সাধারণ মানুষ প্রথমে জড় ও চিৎকে যে পরস্পরবিরোধী বিষয় বলে মনে করেছিল, তা যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে জড় ও চিৎ একই পরম সত্তার দুইটি দিক। তারা এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ যে, তাদের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা চিন্তা করা যায় না। একারণে তাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, তাদের মধ্যে ঐক্য ও সুসংহতি বিদ্যমান। তাই এই দুইয়ের সমন্বয়েই ব্যক্তি জগতের মধ্যে অবস্থান করে পরম সত্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

উপসংহার:

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, জড়বাদী ও বৈরাগীরা যখন জড় ও চিৎ-এর মধ্যে একটিকে গ্রহণ করে অপরটিকে বর্জন করেছেন তখন তাদের দর্শন অখন্ড বলে অদ্বৈত হলেও পূর্ণাদ্বৈত হবে না। কেননা পূর্ণাদ্বৈত হতে হলে জড় ও চেতনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের এই পূর্ণাদ্বৈতবাদী ভাবনাকে অনুধাবন করতে হলে উপনিষদীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ধারণাটিকে আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য এবং জগৎ তাঁর সীমিত রূপ বলে জগতের যাবতীয় জড় ও চেতন বস্তু তাঁরই প্রকাশ। সুতরাং সকল বিষয় তাঁরই প্রকাশ বলে জড়বাদীদের মত পোষণ করে আমরা একথা কখনই বলতে পারি না যে, জড়ই একমাত্র সত্য; আবার বৈরাগীদের মত অনুসরণ করে এমন কথাও বলতে পারি না যে, চিৎই একমাত্র সত্য। শ্রীঅরবিন্দের মতে, জড় ও চিৎ উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এই দুইয়ের সমন্বয়ে একটি শৃঙ্খলিত পূর্ণাঙ্গ দর্শন গঠন করাই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) অনির্বাণ। দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ২০১৬।
২) ঘোষ, গীতা। শ্রীঅরবিন্দ ভাবনা (দিব্যজীবন গ্রন্থের আলোকে)। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি।
৩) রায়, দিলীপ কুমার। শ্রীঅরবিন্দ দর্শন (পূর্ণাদ্বৈতবাদের এক ভূমিকা)। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ২০১৭।
৪) রায়, সুনীল। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন মন্থনে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।
৫) শ্রীঅরবিন্দ। দিব্য-জীবন। অনির্বাণ (অনুবাদক)। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ২০২০।
৬) Lal, Basant Kumar. Contemporary Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishers, 2002.